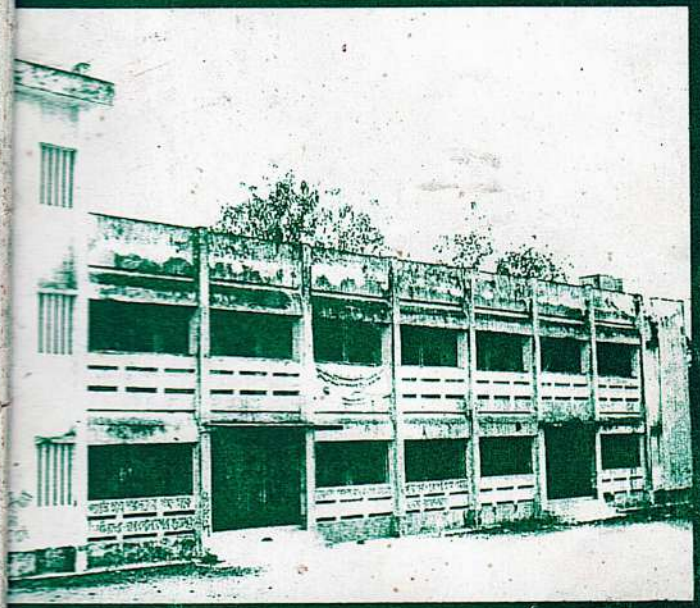
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'০৬ উপলক্ষে
দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের
'দীঘিফুল' প্রকাশনা স্বার্থক হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয় ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

দীঘিফুল



প্রকাশনায়
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,দিঘীনালা ডিগ্রি কলেজ।

দীঘিফুল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/০৬ উপলক্ষে প্রথম প্রকাশনা

প্রকাশকাল- ২১শে ফেব্রুয়ারী /০৬

সম্পাদক- সুশান্ত চাকমা

সহকারী সম্পাদক- নিটোল চাকমা

- সদস্য- নিলোৎপল চাকমা (অনুপম)
- সদস্য- জেসমিন ত্রিপুরা (কার্তিক)
- সদস্য- কামরুন নাহার
- সদস্য- নাসরিন
- সদস্য- গিয়াস উদ্দিন
- সদস্য- সোহাগ

সার্বিক সহযোগীতায়- লালন চাকমা

তত্ত্বাবধানে- প্রীতি খীসা

প্রচ্ছদ ছবি - দীপু চাকমা।

কম্পিউটার কম্পোজ- রিপন চাকমা, জুম প্রিন্টার্স,
কলেজ গেইট, দীঘিনালা।

শুভেচ্ছা মূল্য –২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

	সম্পাদকীয়	পৃষ্ঠা নং-৩
	আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কিছু কথা-*শক্তিপদ ত্রিপুরা*	-৪
	আমি যদি সমঅধিকার কর্মী হতে পারতাম-*আনন্দ মোহন*	-১৬
	সুশীল সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা-*জরিত চাকমা*	-২১
	আমি যদি সমঅধিকার কর্মী হতে পারতাম-*আনন্দ মোহন*	-১৬
	সুশীল সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা-*জরিত চাকমা*	-২১
	প্রতিহিংসা, উগ্রতা, আত্মঘাতী-*কমল বিকাশ চাকমা*	-৩০
	কবিতাগুচ্ছ-	-৩৪-৪০
	বিচ্ছিন্ন চরের মানুষ-*রাখী চাকমা*	-৪১



শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবস উপলক্ষে দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের

ছাত্র-ছাত্রীদের **দীঘিফুল** নামে প্রকাশনার

উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

প্রকাশনার সংশ্লিষ্ট সকলকে

শুভেচ্ছা জানাই।

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)

চেয়ারম্যান

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই প্রথমবারের মত দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা **দীঘিফুল** নামে সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা মুক্ত মনের বিকাশ ঘটায়,মনকে করে পরিশীলিত। এই প্রকাশনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভা বিকাশে সুযোগ পাবে এবং সাহিত্যও সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে।

ইহা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশে সোপান হিসেবে কাজ করুক এই প্রত্যাশা রেখে আমি এর সাফল্য কামনা করছি।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দীঘিনালা,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সম্পাদকীয়

আজ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী '০৬ইং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে আরও তাৎপযপূর্ণ করার লক্ষ্যে দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে **"দীঘিফুল"** নামক দেয়ালিকা থেকে সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত করা হল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র -ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী গুলোর আশা তাদের স্ব-স্ব ভাষা সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে স্বীকৃতি পাবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নিজ নিজ মাতৃভাষা ও বর্ণমালার মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারবে।। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি দেশ হবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র লিঙ্গ ক্ষেত্রে থাকবে না বিভেদ।

"দীঘিফুল" প্রকাশ করতে দীঘিনালা সুধী সমাজের অনেক সৃজনশীল, মননশীল ব্যক্তিদের গুরত্বপূর্ণ পরামর্শ আর্থিক সহযোগিতা ও লেখা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আনন্দ মোহন চাকমাকে উল্লেখ না করে পারি না। আমাদের অনেক লেখা জমা পড়েছে। কিন্তু সবগুলো ছাপানো সম্ভব নয় বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। যাদের লেখা চাপা হলো না আগামীতে ছাপা হতে পারে।

প্রথম প্রকাশনার ভুল- ত্রুটি গুলো সুন্দর দৃষ্টিতে ও পরামর্শ দেয়ার অনুরোধ করছি। আগামীতে **"দীঘিফুল"** সমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা রাখি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কিছু কথা

------শক্তিপদ ত্রিপুরা

মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। তাইতো মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষাকে মায়ের দুধের সাথে তুলনা করেছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে কথা বলে যত পরিমানে আনন্দ পাওয়া যায়, সাবলীলভাবে ভাব প্রকাশ করা যায় ভিন ভাষায় তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একটি ভাষা পরাধীন হলে সে ভাষার জাতির মানুষের চিন্তা বিকশিত হতে পারে না, সে জাতির সাহিত্য বিকশিত হতে পারে না। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি জাতির বিকাশ ও অগ্রগতিকে স্তব্দ করে রাখে। সে জন্যেই মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। আমাদের দেশেও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির দাবিতে সংগ্রাম হয়েছিল। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে তৎকালীন পূর্ববাংলার মানুষেরা আন্দোলন করেছিল যা বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের সালাম, বরকত প্রাণ দিয়েছিলেন। জীবন দানের বিনিময়ে সংগ্রামের বিনিময়ে অবশেষে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই পৃথিবীতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

বাঙালিরা, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। পাকিস্তানের সরকার প্রথমদিকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে এসে জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে বলেছিলেন- 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। সেদিন তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ছাত্র সমাজের বিক্ষোভের মিছিলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে।

পৃথিবীতে এভাবেই শাসকগোষ্ঠীরা নিজ দেশের জনগণের বা জাতিসমূহের ন্যায্য দাবী ও সংগ্রামের দমন পীড়নের মাধ্যমে স্তব্দ করে দিতে চায়। সব শাসক গোষ্ঠীর চরিত্রই একইরকম। রাষ্ট্র নিজ থেকে তার জনগণের, দেশের অধিবাসী বিভিন্ন জাতির অধিকার স্বউদ্যোগে দিতে চায় না। একমাত্র গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সরকার সে যে কোন জাতি বা ধর্মের হোক না কেন তার দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধাবোধ করে না। শাসকগোষ্ঠী ভিন জাতি বা ভিন ধর্মের কারণে কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব করে না এবং দমন পীড়নের মাধ্যমে জনগণের নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে না।

মধ্যযুগে ভিন জাতির রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ঃ

মধ্য যুগে বাংলা ভাষা লিখিতরূপে সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষি নয় এমন রাষ্ট্রনায়কদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যযুগে যে সময়কালে বাঙালিদের কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না সে সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে আদিবাসী রাজা, মহারাজা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষত: মধ্যযুগে ত্রিপুরা মহারাজা বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যের লিঙ্গোয়া ফ্রাংকা ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজা ও রাজপরিবারের সদস্যরাও কক্বরকের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথসহ বহু বাঙালী সাহিত্যিক ও মণীষীকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে আন্তরিক ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার বহু আগে ত্রিপুরা মহারাজা কর্তৃক কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজাদের বাঙালি পন্ডিত, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরা মহারাজা শুধুমাত্র বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নয় স্যার জগদ্বীশ চন্দ্র বসুর গবেষনা ও শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজারা রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠাকাল হতে ফি বছর আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ত্রিপুরা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর কর্তৃক চার খন্ডে লিখিত মধ্যযুগের ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ **"রাজমালা"** বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার

ছিনিয়ে এনেছে। সুতরাং, ২৫ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের ফসল হল এই মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। ইতিহাসে আরেকবার প্রমাণিত হল কোন জাতির সংগ্রাম কখনো বৃথা যায় না। পাহাড়ীরাও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৭ সালে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করলো। সুতরাং, সংগ্রামই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার একামত্র হাতিয়ার। তাই, সংগ্রামের পথ বেয়ে পাহাড়ীদেরকে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু পূর্ব হতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বিশেষত: আদিবাসী বৈদ্যরা তাদের লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব হরফ ও নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতো। বর্তমানেও বৈদ্যরা অনুরূপভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিশেষত: মারমা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ক্যং-এ বার্মীজ হরফে মারমা ভাষায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতো। বৃটিশ সরকারও চাকমা ও মারমা ভাষায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিল। একসময় ত্রিপুরা মহারাজারাও ত্রিপুরা ভাষা বা ককবরকের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনা করতো বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এমনকি মধ্যযুগের ইতিহাস ভিত্তিক অমূল্য কাব্যগ্রন্থ রাজমালার মূল গ্রন্থ ত্রিপুরা ভাষায় ছিল বলে জানা যায় যা পরবর্তীতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আদিভাষা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভিয়েতনাম, নেপাল, ডেনমার্ক, ভারত ইত্যাদি দেশে আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুরত আছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, মিজোরাম, আসাম, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে চলে আসছে। কোন কোন রাজ্যে শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত নয় মাধ্যমিক, কলেজ এমন কি কোন কোন আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ানো হয় বলে জানা যায়। অথচ ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ হয়েও আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর অবধিও আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করা হয়নি। একটি রাষ্ট্র কতটুকু অযোগ্য ও সাম্প্রদায়িক হলে এতদুর নিচে নেমে যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঃ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সকল জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হওয়া বাঞ্চনীয়। কিন্তু, অতীব দু:খজন যে, আজ বাংলাদেশে যে ৪৫ টির বেশী আদিবাসী জাতি ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতি রয়েছে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সরকার প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং, এ সব আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের শাসনযন্ত্রই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নিপীড়ন নির্যাতন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সরকারের এই শাসনযন্ত্র একটি অন্যতম বাধা। তথাপি আজ বাংলাদেশে আদিবাসী বা অ-আদিবাসী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হবার পেছনে মূলত: রাষ্ট্রের আন্ত রিকতার অভাবই মূল কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া বা এই চুক্তির অংশ হিসেবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু না হওয়ার পেছনেও মূল কারণ হল সরকারের আন্তরিকতার অভাব। তাই এটি যেমনি একটি সরকারের ব্যর্থতা তেমনি রাষ্ট্রেরও ব্যর্থতা। বহু সংগ্রাম ও জীবন দানের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নামক এই গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রের জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার দায় রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

আজ বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমিও গর্ববোধ করি যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি শুধু বাঙালী জাতির গর্ব নয়, এটি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরও গর্ব। তবে, **'শহীদ দিবস'** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হওয়ার সাথে সাথে বাঙালী জাতিকে এটিও মনে করিয়ে দেয় যে, এই জাতির এবং এই দেশের কর্তব্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ত্রিপুরা মহারাজার মত আরাকানের রাজারাও মধ্যযুগে বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। অহম রাজাদের রাজসভায়ও বাংলা ভাষা সমাদৃত ছিল বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এভাবে

মধ্যযুগে বিভিন্ন জাতির রাজা-মহারাজা বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেদিক থেকে এসব জাতিসমূহের প্রতি বাঙালী জাতির ঋণ থেকে যায়। সে ঋণ পরিশোধ করার মোক্ষম সময় এখন। কারণ বাঙালী জাতির নেতৃত্বে বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আছে। অন্যদিকে যে সব জাতির কাছে ঋণী সেই ত্রিপুরা, রাখাইন জাতিসহ অন্যান্য আদিবাসী জাতিসমূহের ভাষাসহ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতা আবার রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানেই শেষ নয়, আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্নতাকে আশংকাজনক পর্যায়ে নেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ হিসেবে সরকার ও তার প্রশাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ো যাচেছ। বাঙালী শাসক জাতির ঋণ পরিশোধ দূরে থাক বরং মধ্যযুগে বাংলা ভাষা সংরক্ষন ও বিকাশের ব্যাপারে ভিন জাতির অবদানকে পর্যন্ত অস্বীকার করে চলেছে এ জাতি এবং এ জাতির শাসকগোষ্ঠী। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর নেতিবাচক ভূমিকা এখানেই শেষ নয়, এই শাসকগোষ্ঠী যাদের কাছে ঋণী সে সব জাতির ভাষাসহ সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা দূরে থাক এ সব জাতির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিতে চায় এ দেশে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙালী জাতিকে যেরূপ সংগ্রাম করতে হয়েছিল, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল অন্য কোন জাতি সেভাবে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেনি। তাই, বাঙালী জাতির এই সংগ্রাম ও ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালী জাতির অন্য এ এক বিরল সম্মান। তখন থেকে প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২১ ফেব্রুয়ারী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। তাই, কোন জাতি যদি সংগ্রাম করে সে সংগ্রাম বিফলে যায় না। নিরন্তর সংগ্রাম যে কোন জাতির যে কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভাষা স্বীকৃতি প্রশ্নে বাঙালী জাতির নিরন্তর সংগ্রাম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছে। বাঙালী জাতির এই ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির পথ বেয়ে ১৯৯৯ সালে এসে বাঙালী

জাতির 'শহীদ দিবস' ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা বাঙালী জাতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সম্মানজনক আসনে উপবিষ্ট করলো। ভাষা স্বীকৃতি প্রশ্নে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আদিবাসীদেরকেও সালাম, বরকতদের নিকট থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের ভাষা ও শিক্ষার অধিকার ঃ

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের অধিকারের সনদ। এই চুক্তি বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার সম্পাদিত হয় ১৯৯৭ সালে। এই চুক্তির (খ) অনুচ্ছেদের ৩৩নং ধারায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে সরকার এবং চুক্তির এই বিষয়টি আইনে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে চুক্তির মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারের সনদ পেলেও সরকার তা অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করেনি। যে শেখ হাসিনা সরকার এই চুক্তি করেছিল সেই শেখ হাসিনা সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে যায়নি। তেমনি বর্তমান জোট সরকার ও ক্ষমতায় এসে চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও তার সরকারের মেয়াদ শেষ হতে চললো অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার ব্যাপারে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু নয় এই জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কোন কিছুই বাস্ত বায়ন করেনি। বরং, চুক্তি লংঘন এবং চুক্তিকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। যে বাঙালী জাতি মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করেছিল, জীবন দিয়েছিলন সে জাতি আজি একটি স্বাধীন দেশের শাসক হয়ে দেশের অপরাপর জাতির মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না- এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কিইবা হতে পারে। বাংলাদেশে বাঙালী ছাড়া আরো ৪৫টির অধিক আদিবাসী জাতি রয়েছে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস রয়েছে। শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ ভাষাভাষির লোক বাস করে যারা বাঙালী নয়। এ সব জাতির আলাদ ভাষা, আলাদা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এ সব পাহাড়ী জাতিরা দীর্ঘ ২৫ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে সব ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়নি এবং

স্বীকৃতি পাবার জন্যে যে সব জাতির আন্দোলন চলছে তাদের পক্ষে দাঁড়াবার দায়িত্ব বর্তায়েছে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির কাছে। যদি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি এ সব জাতির পক্ষে না দাঁড়ায় বিশেষত: নিজ দেশের বিভিন্ন জাতির যে সব ভাষা রয়েছে সে সব ভাষা যদি স্বীকৃতি না পায় এবং এই স্বীকৃতির আন্দোলনের পক্ষে যদি বাঙালী জাতি না দাঁড়ায় তা হলে বাঙালীর ভাষা আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির যদি এই দায়বদ্ধতা হয় তা হলে এখন প্রশ্ন বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি কি এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে? সবাই নির্দ্দিধায় বলবে- বাংলাদেশ জাতি এই দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করছে না। বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়কে ধার্তব্যের মধ্যে না আনলেও দেশের ভেতরে যে সব অপরাপর জাতিসমূহ রয়েছে সে সব জাতিসমূহের ভাষাকে স্বীকৃতি দান বা তাদের ভাষা স্বীকৃতির আন্দোলনে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে অর্থবহ ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অন্যায্য হবে না। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সহিত পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যে দায়িত্ব পালন করার কথা সে দায়িত্ব ও কর্তব্যতো পালন করছে না; উপরন্তু সরকার নিজেই প্রতিবন্ধক হয়ে আছে আদিবাসীদের ভাষা স্বীকৃতি ও তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। দু দুটি সরকার শেখ হাসিনা সরকার ও বর্তমান জোট সরকার উভয়ই চুক্তির আলোকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার বিষয়টি বাস্তবায়ন করেনি। এ ব্যাপারে কিছু কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবি বক্তব্য রাখলেও অধিকাংশই নীরব। সত্যিই এটি অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে, যে জাতি মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবীতে আন্দোলন করেছিল, জীবন দিয়েছিল সে জাতি কিভাবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শাসক জাতি হয়ে দেশের শাসনাধীন জাতির ভাষাকে অস্বীকৃতি জানায় এবং নির্লজ্জভাবে ভিন জাতির উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। নিশ্চয়ই বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মর্মার্থ এটি নয়। বায়ান্ন'র ভাষা

আন্দোলন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম ছিল শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম ছিল একটি ন্যায্য সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম একটি জাতির মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বটে।

সুতরাং, বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মর্মার্থ শাসক জাতি হয়ে ভিন জাতি বা জাতিসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা বা অবদমিত করা নিশ্চয়ই নয়। বরং, আমি মনে করি বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা- কোন জাতির ভাষা স্বীকৃতির দাবীকে ন্যায্য মনে করা। কিন্তু আজ বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর আচরন দেখে মনে হচ্ছে এই সরকারের মাঝে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রেতাত্মাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সরকারও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় সাম্প্রদায়িক আচরন প্রদর্শন করছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই বাঙালী জাতির শাসকগোষ্ঠীর নিকট থেকে কোনভাবে এটি আশা করা যায় না। এত অল্প সময়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির উপর দমন পীড়ণের ইতিহাস এত সহজে ভূলে যাওয়া চিন্তাই করা যায় না। আত্মবিস্মৃতিই বটে।

বাঙালী বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজের প্রতিঃ

আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার দিক থেকে ১৯৫২ সালের পাকিস্তানী সরকার ও বাংলাদেশের সরকারের মধ্যেকার কোন ভিন্নতা নেই। সুতরাং বাংলাদেশের সরকারসমূহ সে দিক থেকে একটি সাম্প্রদায়িক সরকার। পাকিস্তানের সরকার বাংলা ভাষার প্রতি অন্যায় ও সাম্প্রদায়িক আচরণ করেছিল আর এখন বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী জাতিসমূহের বিভিন্না ভাষার উপর অন্যায় ও সাম্প্রদায়িক আচরণ করছে- এই শুধু পার্থক্য। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি যে বাঙালী জাতি মাতৃভাষার জন্যে সংগ্রাম করেছিল, জীবন দিয়েছিল সে বাঙালী জাতির শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ভিন জাতির ভাষাভাষি নিষ্পেষিত হচ্ছে আর সেই ভাষা প্রেমিক বাঙালী ভাইয়েরা নির্বিকার নিশ্চল-এটি আমার কাছে খুবই অবাক লেগেছে। গুটি কয়েক বাঙালী বুদ্ধিজীবি ব্যতিত এ ব্যাপারে কেউ কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেনি, করছে না। আমি মনে করি যে সব বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজ ও বিবেকবান বাঙালীরা আদিবাসীদের ভাষা স্বীকৃতির আন্দোলন সামিল হয়নি তাঁরা আদিবাসীদের প্রতি সুবিচার করেননি এবং একজন বিবেকবান বাঙালী হিসেবে নিজ দায়িত্ব

যথাযথভাবে পালন করেনি। যে জাতি মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করেছিল, জীবন দিয়েছিল সে বাঙালী জাতির বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজ ও বিবেকবান মানুষের কাছে সহযোগীতা পাবার প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অন্যায্য নয়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও আমাদের দায়িত্ব ঃ

অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়া যে কোন জাতির মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশ সরকার সর্ব স্তরের শিক্ষায় আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে চালু করার ব্যাপারে স্বীকৃতি না দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছে। আংশিক হলেও বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এই সাংস্কৃতিক অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। এই আংশিক সাংস্কৃতিক অধিকারসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণ যে অধিকার পেয়েছে তার জন্য দীর্ঘ ২৫বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ইতিহাসের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে জুম্ম জনগণকেও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং চুক্তিতে স্বীকৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে। এটাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। সুতরাং এই অধিকার জুম্ম জনগণকেই বাস্তবায়ন করতে হবে নিরন্তর সংগ্রামের পথ বেয়ে ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, শাসকগোষ্ঠী কখনো আপনা আপনি কোন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না। এই রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, সাংগঠনিক উদ্যোগের যেমনি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগের। প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু জেলা পরিষদের একটি হস্তান্তরিত বিষয় সেহেতু জেলা পরিষদের তরফ থেকে যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে জেলা পরিষদের পরিষদকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সামাজিক না নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এভাবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট

প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন যাতে ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে নাগরিক তরফ হতে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে নিরন্তরভাবে কাজ করে যাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপসংহার ঃ

সমাজ, সংস্কৃতি সততই পরিবর্তনশীল। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশের সমাজে এবং এই সমাজের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের এই পরিবর্তনকে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে চাই। বাংলাদেশে একদিন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং এই সমাজ একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এই ভাবনাটাই করতে চাই। এই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সরকার আদিবাসীসহ দেশের সকল জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এমন সরকারের প্রত্যাশায় হাত পা গুটে বসে থাকাটা নিশ্চয়ই আদিবাসীদের উচিত হবে না। নিজেদের ভাষা তথা সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নিজেদের অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তরভাবে। কারণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সংগ্রামের বিকল্প নেই। আদিবাসীদের নিরন্তর সংগ্রাম অবশ্যই অবশ্যই তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠ করবেই।

দিঘীনালা ডিগ্রি কলেজের সকল শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তাদের প্রকাশতি দীঘিফুল প্রকাশনার সাফল্য প্রত্যাশা করি।

জাহাঙ্গীর আলম
সভাপতি
দিঘীনালা প্রেস ক্লাব।

আমি যদি সমঅধীকার কর্মী হতে পারতাম !

----------আনন্দ মোহন চাকমা (আনন্দময়)

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ- প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি এই প্রবন্ধে আক্ষরিক স্বার্থে মানব সমাজের প্রাক-ঐতিহাসিক কিছু তত্ত্ব ও তথ্য এখানে তুলে ধরছি। মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ভূ-তাত্ত্বিক এবং নৃ-তত্ত্ববিদদের বহু গবেষনা লব্ধ তথ্য ও তত্বের ভিত্তিতে জানতে পারি যে, আদিম পৃথিবীতে প্রাণীর ক্রম বিভাজন প্রক্রিয়ায় আধুনা মানব জাতির সৃষ্ট। এই মানব জাতির প্রাক ঐতিহাসিক যুগে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ বিধানে নব আর্বিভূত মানবগোষ্ঠীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এবং বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধির বিস্তৃতি ঘটতে থাকলো। বিশেষ করে জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রাচীন মানব গোষ্ঠী এক পর্যায়ে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাঁচার তাগিদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো দূর-দূরান্তের নিত্য নতুন জায়গায়। মানুষের সমাজ ব্যবস্থা তখন কিন্তু পুরোটাই আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। কোন খাদ্যবস্তু পেলে সবাই মিলে উদর পূর্তি করার মাঝেই ছিল তাদের ভোগ করার আদিম বৈশিষ্ট্য। "বাঁচার তাগিদে খাদ্য" আর এই খাদ্যের অন্বেষণে প্রাচীন মানুষদের বিচরণ ক্ষেত্রের বিস্তৃতির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে উন্মেষ ঘটতে থাকলো মানব সভ্যতার। এই সভ্যতার ঐতিহাসিক স্রোতধারায় সৃষ্টি হলো পুরাতন পাথরের যুগ ও নতুন পাথরের যুগের অবিচ্ছেদ্য মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনী এবং সভ্যতার আপন প্রবাহের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলো প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ নামে মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তরের বহু রহস্যাবৃত কাহিনী।

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে "একটি খাদ্যে সবার অধিকার" এই আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ক্রমে ভেঙ্গে গিয়ে মানব সমাজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রথমে ছোট-খাটো দলে এবং পরে পারিবারিক গোষ্ঠী তন্ত্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো। পরবর্তী সময়ে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থান বিশেষে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার প্রয়াস পেল। এরই ফাঁকে কয়েকটি দল বা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো এক একটি জাতি গোত্রের, আর এই দল, গোষ্ঠী ও জাতি গোত্রের

স্বার্থে সৃষ্টি করা হলো সরদার বা দলনেতা। এমনি ভাবে সমাজ বদ্ধতার সিঁড়ি বেয়ে মানব সমাজে উঠে আসে উচু-নিচু শ্রেণীর। পরবর্তীতে উচ্চপর্যায়ে যোগ হয় রাজ-রাজাদের চরিত্র; ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হয় মানুষকে দিয়ে মানুষের শোষণ ও শাসন করার ক্রমানুক্রমিক পদ্ধতির। আর শব্দ ও ছন্দের মাধূর্য্য সৃষ্টির কৌশল হিসেবে শাসন-শোষনের কার্য্যাবলীকে মানব সমাজে আখ্যায়িত করা হলো রাজনীতি বা রাজারনীতি হিসেবে; প্রচারিত হলো রাজ-রাজন্য বর্গের অপ্রমেয় প্রজা হিতোষী মুখরোচরক কাহিনী। অবশ্য এতদ্ সঙ্গে যুক্ত হলো বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিভৎস কাহিনী। এমনিভাবে নানা অপ্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেকে টিকিয়ে রাখার অদম্য প্রচেষ্টার মাঝে মানুষের মনে জাগরিত হয়েছে "অধিকার" নামে শব্দটির।

মানুষ যখন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তখনই স্থান বিশেষের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সাথে স্বয়ংক্রিয় ভাবে মানুষের আকৃতি বা চেহারা, গায়ের রং এবং ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি ক্রমানুক্রমিক সভ্যতার বিবর্তনের মাঝে বিভিন্ন এলাকার মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারের ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঠিক উল্লেখিত বৈষম্য সমূহের মধ্য দিয়ে মানব সমাজে এনে দিয়েছে আঞ্চলিক ও দলগত ঐক্যের; সৃষ্টি করে দিয়েছ জাতীয় চেতনা। কিন্তু মানুষ স্বকীয় ভিত রচনা করতে গিয়ে এক জাত আরেক জাতের উপর কর্তৃত্ব গ্রহনের আশায় নানা যুদ্ধ বিগ্রহের উন্মেষ ঘটিয়েছে। এরই কারনে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু জাতি এবং বহু সম্প্রদায়। মানুষ হয়ে মানুষকে বর্বরোচিত আচরণের প্রেক্ষাপটে বিধাতার অপার মহিমায় শান্তি্ম ও সাম্যের বাণী নিয়ে যুগে-যুগে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম প্রচারকগণ। তাঁদের অভিন্ন শান্তি্ম ও সাম্যের বাণীর সংস্পর্শে ক্রমে মানব সমাজে পারস্পরিক দ্বন্ধ সংঘাত কিছুতা কমে আসলেও স্বার্থের মোহে মাঝে মধ্যে এই দ্বন্ধ-সংঘাত প্রলয়ঙ্কারী আকার ধারণ করতঃ পুরো মানব সমাজকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে গেছে এরই প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রথম মহাসমর ও দ্বিতীয় মহাসমর নামে দুই-দুইটি মহাযুদ্ধের ইতিহাস মানব সভ্যতার গতি পথের বাঁধা হিসেবে কলঙ্কের কালিমা নিয়ে ইতিহাসে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের আদিম সাম্যবাদীর সমাজ ব্যবস্থার মানুষ বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ হওয়ার ফলে স্বার্থের প্রয়োজনে ও বিচরণ ক্ষেত্রে প্রসারতার লক্ষ্যে যেমনি উল্লেখিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ সংঘটিত করেছে ঠিক তেমনি বাঁচার প্রয়োজনে

ঊনবিংশ শতাব্দির পরবর্তী ও বিংশ শতাব্দির মাঝ প্রান্তে এসে সমাজের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিদ, বুদ্ধিজীবি ও মানবতাবাদীদের দ্বারা গঠিত হলো "লীগ অব নেশান" নামে মানুষ রক্ষাকারী বিশ্বসংস্থার। আর এই সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতিগোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মতামত সহকারে ঘোষিত হলো "জাতিসংঘ সনদ"। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্র সমূহের সহায়তায় উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা আরম্ভ হলো- অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহকে। এমনি ভাবে মানুষ আবারও ফিরে পেলো একের সাথে অন্যের-এক দেশের অধিবাসীদের সাথে অন্য দেশের অধিবাসীদের ভ্রাতৃতবোধ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমনি ভাবে আবারো পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সহানুভূতি ও সহমর্মীতার কাহিনী আপন মহিমায় স্থান করে নিলো। এরই মাঝে বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্নে বিশ্ব বিবেকের কাছে জাগ্রত হলো পৃথিবীর ছোট-বড় বিভিন্ন রাষ্ট্র তথা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসালোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর কথা। তারা দেখতে পেলো বিভিন্ন বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর চাপে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী নৃগোষ্ঠী গুলো অচিরেই বিলিন হয়ে যাওয়ার বাস্তব চিত্র। তাই বিশ্ববিবেক বা জাতি সংঘের কাছে সুস্পষ্ট ধারণা এলো এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের তথা জাতিসংঘের। কারণ নানা বর্ণ, নানা আকার, সুগন্ধি ও গন্ধহীন মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন ফুলের সমারোহে যেমনি শোভিত হয় পুষ্পোদ্যান; ঠিক তেমনি নানা বর্ণের ও নানা গোত্রের সমারোহে সৃষ্ট বিধাতার এই মানব বাগান। কাজেই মানব সভ্যতার চরম শিখরের দ্বার প্রান্তে এসে মানবতার স্বার্থে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও যাতে পৃথিবী থেকে বিলিন হয়ে না যায় তারই লক্ষে ৯ই আগষ্ট ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস বা বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ। উদ্দেশ্য একটাই -পৃথিবীর নিশ্চিহ্ন প্রায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আদিবাসী নৃগোষ্ঠীকে ঠিকিয়ে রাখা এবং তাদেরকে সহানুভূতির সহিত শিক্ষা-দীক্ষায় যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকার অধিকার এবং বাঁচার মত বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার রত্ন ভান্ডারে বাংলা ভাষা একটি ভাব গম্বীর, প্রাঞ্জল তথা কোটি কোটি মানুষের ভাষা। তার পরেও এই বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে করতে হয়েছিলো আন্দোলন; দিতে হয়েছিলো তাজা রক্ত। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি। "৫২সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী" আপন মহিমায় আজ জাতিসংঘ ঘোষিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু হায়! এই ভাবগম্ভীর অথচ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল তাদের স্বার্থে বুঝে ও না বুঝার ভান করে একেক সময়ে একেক অপব্যাখ্যা দিয়ে শব্দের অর্থবোধটাকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন অপপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে কতেক স্বার্থন্বেষী মহল আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে "আদিবাসী" শব্দটাকে বিভিন্ন ভাবে অর্থবোধক করে বিভিন্ন পরিভাষার ধুম্রজালে আবদ্ধ করার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শত-শত বছর পূর্বে এই এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো নিশ্চিদ্র ঝাড়-জঙ্গল পরিস্কার করে হিংস্র বন্য জন্তু তাড়িয়ে আদি বসতি স্থাপন করতঃ জীবন-যাপন শুরু করে। কিন্তু শত-শত বছর পরে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী "আদি মানেই প্রথম বা প্রাচীন" শব্দবোধকে জেনেও না জানার ভান করে পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ক্ষেত্র বিশেষে বহিরাগত বলে নির্দ্ধিধায় প্রচার চালানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তি দিচ্ছে এটা- অমুক রাজ্যের অংশ ছিল কিংবা অমুক প্রদেশের অংশ ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যে কোন রাজ্য প্রদেশের অংশ হয়েও প্রথমে কারা বসতি স্থাপন করে ছিল, কারা গহীন জঙ্গল সাব করেছিল তা সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উক্ত স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক সময় সুযোগে বহিরাগত বলে অপব্যখ্যা দেয়া বর্তমান সভ্যজগতে কতটুকু গ্রহণ যোগ্যতা পাচ্ছে তা এক মাত্র বিধাতায় জানেন। এখানে এইও উল্লেখ্য যে নদীর পানি সমুদ্রে মিশে গেলে যেমনি নদীর পানির অস্মিস্থ থাকে না ঠিক তেমনি বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠী যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা গুলোর আগ্রাসন চালিয়ে তাদেরকে গ্রাস করে তাহলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সমূহেরও আলাদা কোন অস্বিত্ব থাকে না। এই ধারণার ব্যাখ্যার আলোকে জাতি সংঘ কর্তৃক আদিবাসী দিবস, আদিবাসী বর্ষ ও আদিবাসী দশক ঘোষনা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র রক্ষার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও জাতি সংঘের এক সক্রিয় সদস্য রাষ্ট্র । বিধায় এদেশের আদিবাসীদের রক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব এদেশের সরকার এবং মানবতাবাদী সকল মহলের। দেশের প্রায় ১৩ কোটি জনগোষ্ঠীর মাঝে পার্বত্যএলাকার ৬/৭লাখ আদিবাসী সংখ্যায় লঘু থেকে লঘুতর নয় কি? এর পরেও যদি বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর ভাইরা এসে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পরিবর্তে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করেন তাহলে পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি ?

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "চন্দ্রের কাছে সূর্যের আলো চাওয়ার মত"। পার্বত্য এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সমঅধিকার আন্দোলন নামে কিছু বিভ্রান্তির জাল ছড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই সমঅধিকারের প্রকৃত সংজ্ঞা কি ? বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বেড়াজালে চিহ্নিত প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী সমূহকে রক্ষা কল্পে বিশ্ববিবেক যেকানে সোচ্চার ঠিক সেখানে আমাদের দেশের পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহের উপর এই কোন অনাচার ? আমি মনে করি পার্বত্য এলাকার সমঅধিকার মানে বৃহত্তর বাংলার পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাতে কোন অবস্থায় নিচিহ্ন বা বিলিন না হয় সর্বপ্রথমে এর সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহন করা। এর পরে শিক্ষা-দীক্ষা, স্বকীয় সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার সুযোগ, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চপদস্থ ও নিম্ন পদস্থ সকল প্রকার সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক অধিকার, পুলিশ, বিডিয়ার ও সেনাবাহিনীর মত দেশের গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্বে পার্বত্য এলাকায় আদিবাসীদের সমান সংখ্যক নিয়োগদান, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সমূহকে ব্যবসা-বানিজ্য বিশেষ সুযোগদান, পার্বত্য এলাকার যুগোপযোগী মিল কারখানা স্থাপন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সর্বোপরি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী সমূহকে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ- ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার বর্তমান প্রেক্ষাপট আমি একজন শিক্ষক। সে হিসেবে আমি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী পর্যায়ে সমাজের কাছে নিবন্ধন ভূক্ত। এছাড়া রাজনীতি করা আমার শোভা পায়না। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় যখন সমঅধিকারের আওয়াজ শুনতে পাই তখনই একজন আদিবাসী হিসাবে নিজের ভবিষ্যত অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে মনের মাঝে ইচ্ছা জাগে "আমি যদি সমঅধিকার কর্মী হতে পারতাম"।

জুম প্রিন্টার্স

Joum Printer's

এখানে কম্পিউটার কম্পোজ ও সকল প্রকার ছাপার কাজ
অতি যত্ন সহকারে করা হয়।
কলেজ গেইট,দীঘিনালা,খাগড়াছড়ি।

সুশীল সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা

----------জড়িতা চাকমা

যে কোন দেশে সমাজ, সরকার পরিচালনায় যারা পথ দেখায় তারা হচ্ছেন সে দেশের বুদ্ধিজীবি সমাজ। '৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হচ্ছে এদেশের সমাজ সচেতন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবিদের চিন্তা এবং ত্যাগের ফসল। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোনে অবস্থিত চির অবহেলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহের আদিবাস স্থান হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্বাসমূহের মধ্যে বস্তুতঃ স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবি বলতে যাদের বুঝায় তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুব একটা বিরল ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হবেনা। তারপরও এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ডানা বেঁধে উঠেছে। বৃটিশ-ভারত শাসন কালে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন আইন'র পর ১৯৯৭সালে ২ডিসেম্বর "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আরেকটা অধিকারের সনদ রচিত হয়েছে। এটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশবরেণ্য জুম্ম বুদ্ধিজীবিদের দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অগণতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোধীনে হলেও এটাকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার আন্দোলন। এক কথায় এ আন্দোলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিকভাবে শাসনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামকে তখনকার সময়ে ভারতের অন্ত র্ভূক্তির আন্দোলন হিসেবে। এর অর্থ কিন্তু এটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলা যায় না। জাতিগত নিপীড়ন-নির্যাতন, শাসন-শোষন ও সকল প্রকার বঞ্চনার অবসান করে জুম্ম জাতিসত্বাসমূহের নিজস্ব সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয়-বিশ্বাস, সর্বোপরি জাতিসত্বাসমূহের নিশ্চয়তা ইত্যাদি এক কথায় স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

এখনকার মত তখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তার প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা মাত্র সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল বলা যায়। ঠিক এমনি সময়েই ১৯৪৭ সালের

৪আগষ্ট রাত ১২টা হতে ১৯আগষ্ট পর্যন্ত্ব রাঙ্গামাটি শহরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভারতের তেরঙা পতাকা উড্ডীন ছিল। ২০আগষ্ট পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্ট এসে এ পতাকা নামিয়ে দিয়ে সেখানে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। তারপরই তখন ভারতের অন্তর্ভূক্তি স্বপ্নদ্রষ্টা, পরলোকগত স্নেহকুমার চাকমা, গনেশিয়াম দেওয়ান, কালিকা প্রসাদ চাকমা, ভাগ্যচন্দ্র চাকমা, রাজেন্দ্র চাকমা প্রমুখ অনেক নেতা কর্মীও সমর্থক প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশ ত্যাগ করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতে পাড়ি জমান। তার কিন্তু তাদের ভারতের একনিষ্ট সমর্থক বলা যায় না। যেহেতু শেষ জীবনে তাদের জীবদ্দশায় প্রয়াত স্নেহ কুমার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক সময় তারা তখনকার কংগ্রেস সরকারকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে শুনা গেছে। যেহেতু তদানিন্তন কংগ্রেস সরকারও তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না। উপরন্তু কতিপয় প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন।

অপরদিকে যারা এখানে ছিল তাদের মধ্যে স্মরণীয় জনৈক এক ব্যক্তি ছিলেন, তার নাম নির্মল চন্দ্র (পাকিস্তান মাষ্টার)। তিনি খাগড়াছড়ি উপজেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় পাবলাখালী মৌজায় সাবেক হেডম্যান শ্রী প্রফুল্ল দেওয়ানের ভগ্নিপতি। তিনি কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করেননি। তবে এক অভূতপূর্ব কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন। তার মূল ঘটনা-রাঙ্গামাটিতে ভারতের পতাকা নামিয়ে পতাকা পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানোর পর অভিমানে স্ফীত হয়ে তিনি মুসলমানের মত লম্বা গোঁফ রাখতে শুরু করেন। পরে পূর্ব পাকিস্তান বিলুপ্তির পর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তার রাখা গোঁফের একটি (ডান/বাম) অংশ সবসময় সেভ করে রাখতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কয়েকটি বছর পর তিনি মারা যান। তিনি তার জীবদ্দশায় আমরণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করে গেছেন। তার মূল কারণ হচ্ছে তখন তারা পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তাদের কেউই বাঙালী বিদ্বেষী ছিলেন না। সে সময়ে অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে জুম্মদের গ্রামে সারাটা বছর কাটিয়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে তবেই তাদের দেশের বাড়ীতে চলে যেতেন। চলাফেরা করতেন প্রতিবেশীর মতো আপনজ্ঞান নিয়ে। ব্যবসায়ীক লেনদেন চলতো কোনো লিখিত দলিল ছাড়া, কেবলমাত্র মৌখিক কথা ও বিশ্বাসের উপর। এই ছিল তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির চিত্র।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বিভক্ত উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভূক্তির পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শোষণ-বঞ্চনার শুরু। যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণ একদিকে দেশীয় সামন্তবাদী শাসন-শোষণ অপর দিকে বিজাতীয় শাসন-শোষণের যাতাঁকলে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। উচ্চ শিক্ষিত কিংবা লেখা পড়া জানা লোক কম হওয়াতে তখন সরকারী অফিস আদালতে জুম্ম চাকুরীজীবি ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন। চাকুরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আগ্রহ ও খুব একটা ছিল না বলে প্রবীনদের মুখ থেকে শুনা যেতো। ঠিক সে যুগে প্রবীন শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণ কিশোর চাকমার অভ্যুদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। তখন একজন সরকারী স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে পশ্চাৎপদ জুম্ম সমাজকে তিনিই প্রথম শিক্ষার আলোক বর্তিকা দেখিয়েছেন। তার সেই আলোক বর্তিকা অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সভ্যতা উন্মেষ ঘটেছিল। সরকারী চাকুরীজীবি হলেও তিনি স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবি মতো সমাজ সেবা করে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জুম্ম বুদ্ধিজীবিদের কেমন হওয়া উচিত সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয় চেতনায় অগ্রদূত প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাদের মতো একটি পরিবার গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ সংস্কার ও সুশীল সমাজে তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

তখন আরো অনেক জুম্মকে সরকারী শিক্ষকতা চাকুরী ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী তার অনুজ চিত্ত কিশোর চাকমা তখনকার সময়ে মহাপুরম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সমাজের সংস্কারের কাজে হাত দেন। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে স্কুলে গমনোযোগী জুম্ম ছেলে ও অবিভাবকদের উৎসাহিত করতেন। গরীব ছেলেদেরকে বই-পুস্তক ক্রয় করে দিয়ে স্কুলে ভর্তি করাতেন। তিনি শেষ জীবনে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে পরলোক গমন করেন। তার জীবদ্দশায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে থাকাবস্থায় ও নিজ পেশাগত দক্ষতা ও যোগত্য বলে অনেক ছাত্রকে জ্ঞান দান করে গেছেন। তার জ্ঞানমুগ্ধ অনেক ছাত্র আজ সরকারী চাকুরীজীবি ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেক সুনামী অধিকারী হয়েছেন।

স্বর্গীয় চিত্তকিশোর চাকমার পুত্র প্রয়াত সুবেন্দু প্রবাস লারমা কৃষি কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আন্দোলনের অংশগ্রহনের আগে সুবেন্দু এক আদর্শ কৃষক হিসেবে

কৃষি ব্যাংক ও কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ রেখে দরিদ্র কৃষকদের সাহায্য সহযোগীতা করতেন। প্রয়াত নেতা এম.এন লারমা (প্রবাহন) এবং বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে শিক্ষাবিদ ও পার্টি প্রতিষ্ঠা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি খোঁজ করতে গেলে তাদের নামও সর্বাগ্রে এসে যায়।

সে দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে পেতে আগ্রহী। আমি বিশ্বাস করি- পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষিত মহলে যারা আছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে তারাও জনসেবামূলক ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু আজকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সদূর অতীত থেকে অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবি নেই। যারা সরকারী চাকুরীতে ছিলেন তাদের মধ্যেও প্রশাসনিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি সংখ্য অত্যন্ত নগণ্য। বাংলাদেশ হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষিত যারা ছিলেন তাদের কেহ কেহ হয় চাকুরীজীবি নয়তো চাকুরী পেতে ব্যাপৃত। অপর পক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে সচিবালয়ের সচিব থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরীজীবিরা পর্যন্ত রাজনৈতিক দলমত নিরপেক্ষ নহে। সেই আলোকে জুম্ম চাকুরীজীবিরা তাদের সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। এখানে জুম্ম চাকুরীজীবিদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা চেতনায় বিকাশ ঘটতে পারেনি। আর তাই জুম্ম সমাজে স্বাধীন বুদ্ধিজীবিও গড়ে উঠতে পারেনি। উপরন্তু যে কোন একটা দলের সমর্থক না হলে সরকারী চাকুরী জুটে না। সেক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিত সুশীল সমাজের কিছু কিছু মানুষ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাকে সম্ভল করে সরকারী চাকুরীর সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে ব্যস্ত। অতীতে শ্রদ্ধেয় পরলোকগত কৃষ্ণকিশোর যেভাবে শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কাজ করে গেছেন আজকের জুম্ম সমাজের যারা বুদ্ধিজীবি হিসেবে পরিচিত তারা ও সেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগী ভূমিকা রাখতে পারেন।

দেশপ্রেমের নূন্যতম গুণ ছাড়া জাতি সেবা করা সম্ভব হতে পারে না, সেটা আমরা দেখেছি। আমাদের জুম্ম সমাজের কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি সম্প্রতি রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও কেবল মাত্র নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যেই নিজেদেরকে সংকীর্ণ

গন্ডীবদ্ধ রাখতে চান। নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার পর তারা জনগণকে, জনগণের স্বার্থকে ভুলে যান। জনগণের মূল দাবিকে নিজেদের সুবিধামতো নাড়া দেন। চুক্তিত্তোর নির্বাচনে সেরকম আমরা অনেক ঘটনাকে দেখেছি। অনেক জনদরদী স্বাক্ষী গোপালকে আমরা দেখেছি। তা না হলে বিগত সরকারের আমলে ২০০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হতে পারতো। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজও অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিও আছেন যারা গণমুখী কল্যাণ মূলক কাজ করতে পারেন। তাদের উচিত কোনটি সঠিক চিন্তাধারা সম্পন্ন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক সেটা সাধারণ জনগণকে বুঝিয়ে দেয়া। তারা স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সরকারী চাকুরে, ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী, কারিগর ইত্যাদি হিসেবে যেভাবেই হোক না কেন সাধারন জুম্ম জনগণকে তারা বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও করণীয় সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দিতে পারেন।

বিগত দিনে '৮৩'র গৃহযুদ্ধ চলাকালে এক ভদ্রলোক বলছিলেন যে, ..."লারমা গ্রুপ ঠিক না প্রীতি গ্রুপ ঠিক?" অর্থ্যাৎ মূল পার্টি (লারমা গ্রুপ) আর বিভেদ পন্থী (প্রীতি গ্রুপ) এক কথায় লাম্বা-বাদি গ্রুপ....এই দু গ্রুপের মধ্যে ঠিক/বেঠিক চিহ্নিত করা বাস্তবিক এক সময় খুব কঠিন হয়েছিল। তখন আমাদের জবাবটা ছিল এই, ..."মূলতঃ এম.এন. লারমা আমাদের পার্টির নেতা। তার কথা বলার ধরণটা হচ্ছে ধীরে সুস্থে অগ্রসর হওয়া। তাই সর্বাগ্রে তিনি বক্তাকে বলতে দিতেন। সবকিছু শুনে পর্যালোচনা করে চুল-ছেড়া যাচাই করে তারপরেই উপসংহার টানতেন। তাই সবার শেষে কথা বলা আমাদেরও নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা আমাদের আগে চক্রদের স্থান দিয়েছেন। তাদের কথা শুনেছেন। কাজেই তাদের কথা আর কাজের মধ্যে সমন্বয় কতটুকু সেটা আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। এমুহুর্তে আজ আর আগ বাড়িয়ে আমাদের বলতে হয় না, ...কে আসল? সেটা বরঞ্চ আপনারাই এখন আমাদেরকে ভালভাবে বলে দিতে পারবেন।" পার্টি প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করে যারা জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং সবশেষে জুম্ম জনগণকে বাদ দিয়ে সরকারের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পন করতে পারে। এখন কারা ঠিক সেটা আজ দূধের শিশুরাও বলতে পারবে।

কিন্তু তারপরও এমন একদিন ছিল, যেদিন কান্না লাম্বা-বাদি (লারমা গ্রুপ ও প্রীতি গ্রুপ) উভয় গ্রুপকে জনগণ খাইয়েছিল। কিন্তু কোনদিন এক গ্রুপের অবস্থান অপর গ্রুপকে বলে দিতনা। সেদিনও আমাদের বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত সুশীল সমাজ সমঝোতার

পরামর্শ দিতেন। কিন্তু কিভাবে সমঝোতা তার দিক নির্দেশনা। আমাদের সেই সুশীল সমাজের সে সকল গুণীজনরা দিতে পারতেন না। তবুও পার্টি অবশ্য দেশ-বরেণ্য অনেক বুদ্ধিজীবির কথা মাথায় রেখে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণসহ কাজ করে গিয়েছিল। কিন্তু বিভেদপন্থীদের ছলনার শেষ ছিল না। তাই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ করে পার্টি প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম.এন লারমাকে তারা নৃশংভাবে হত্যা করেছে। জুম্ম জাতির মধ্যে যে এরকম বিশ্বাসঘাতক জন্মাতে পারে সেকথা আমাদের সাধারণ জনগণ তথা জুম্ম বুদ্ধিজীবিরা কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি হয়তো।

অতীত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। যেকোন রাজনৈতিক দল ও নেতাকে মূল্যায়ন করতে হয় তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নীতি-আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, কর্মসূচী ইত্যাদি'র ভিত্তিতে। সেদিক থেকে এম.এন.লারমা ছিলেন পরীক্ষার অতীত একজন মহান নেতা ও খাঁটি বুদ্ধিজীবি। এই জুম্ম সমাজ যেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তার পরবর্তী যারা ছিলেন তারাও ছিলেন অধিকাংশই শিক্ষক সমাজের মানুষ যারা নতুন জুম্ম সমাজের রূপকার হিসেবে কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন। পার্টিতে একসময় উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ছিলেন বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে শিক্ষকদের আন্দোলন বলা হতো। আজকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ তাই করতে পারেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রগতিশীল চিন্তাধারা সম্পন্ন পার্টি ও সংগঠনকে সহযোগিতা দিয়ে যেতে পারেন। কোন কিছুতেই বিভ্রান্ত না হয়ে সুশীল সমাজ জুম্ম সমাজের কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি হিসেবে নিঃসন্দেহে কাজ দিতে পারেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দুই দশকের অধিক কাল ধরে আন্দোলন করে এসেছে এবং পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই এই পার্টির নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো পরিস্কার। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। কিন্তু জুম্ম জনগণের কাঙ্খিত শান্তি আসেনি এখনো। চুক্তি বাস্তবায়ন হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বাঁচার সংস্থান নিশ্চিত হতে পারতো। কিন্তু আজকে সবাই হতাশাগ্রস্থ হয়ে আছেন। এমতাবস্থায় আশু করণীয় সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজকে গুরুদায়িত্ব পালন করতেই হয়। তবে কিন্তু তারা বিষয়টা কিভাবে নেবেন সেটা তাদের সদয় বিবেচনা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক জে.এস.এস তার দায়িত্ব সম্পাদনকালে যথারীতি অস্ত্র জমাদান

প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯৯৮ সালে ১০ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে কালো পতাকা-বিক্ষোভ আর ফুলের–শুভেচ্ছা একাকার হয়ে যায়। পরে পরিস্থিতি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে রূপ নিলে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ও সুশীল সমাজ কেহই প্রস্তুত ছিলনা। তারপরও এই পরিস্থিতি মোকাবিলার দায়িত্বও সচেতন জনগণের উপর গিয়ে বর্তায়। পার্টি চুক্তি করেছে একান্ত সদিচ্ছার সহিত; কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টি হচ্ছে পার্টির ইচ্ছা নিরপেক্ষ ঘটনা। এই মুহূর্তে এসব বিষয়ে জবাব দিহির জন্য সুশীল সমাজকেও নিশ্চয় ভূমিকা রাখতে হয়। একটা দেশের বুদ্ধিজীবিদের পশ্চাতে রেখে এই রকম সংকট উত্তোরণ সম্ভব হতে পারেনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্বাসমূহকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সচেতন মহলের। অন্যথায় জাতির ধ্বংস যদি হয়ে থাকে তাহলে সবাই-এর জন্য দায়ী। তাতে ব্যক্তি বা মহল বিশেষে কারোর জন্য আলাদা ক্ষমা হবেনা। তাই সুশীল সমাজের কাছে আবেদন হচেছ যে, আপনারা যে যেভাবে পারেন আরো অধিক হারে এগিয়ে আসুন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি সমাজ দেশের বিরোধী দল ও সরকারীদল উভয়দলকে তাদের লেখনীতে স্থান দিয়ে থাকেন। দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে উভয়পক্ষকে দিক নির্দেশ করে থাকেন। আমাদের জুম্ম বুদ্ধিজীবিদের অবস্থা কিন্তু এখনো সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রায় সময় তাদেরকে নীরব দর্শকের মতো মনে হয়। তাদের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়না। চুক্তিবাস্তবায়ন তথা চুক্তি বাস্তবায়নে বিরাজমান সকল সমস্যা মোকাবিলার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

চুক্তিত্তোর কাল হতে আজ পর্যন্ত অন্যায়, অত্যাচার, ধর্ষণ, ভূমি বেদখল ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঘোষিত কর্মসূচী সফল হলেও উদ্যোগটা মনে হয় যেন শুধুমাত্র জে.এস.এস'র কর্মসূচী। কারণটা বুঝতে অত্যন্ত সহজ। বস্তুত জুম্ম জনগণ, সুশীল সমাজ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবি সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া কখনো কর্মসূচী সফল হতে পারে না। আসলে তাদের নেপথ্য ভূমিকার জন্য আজকে তাই মনে করা হয়ে থাকে। সেকারণে আজ দেশে-বিদেশে প্রচারণার ক্ষেত্রে জে.এস.এস ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজপথে আর কেউ নেই মনে করা হতো। ইহা এরকম একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের জন্য

নিঃসন্দেহে নেতিবাচক দিক বলা যেতে পারে। জুম্ম বুদ্ধিজীবি সমাজের প্রচার বিমুখতা ও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' মনোভাব দুরীভূত করতে পারলে আমাদের জন্য আরো মঙ্গল বয়ে আনবে।

সমাজের নিয়ম-কানুন বদলে যাচ্ছে, আন্দোলনের কায়দাকৌশল সবই পাল্টাচ্ছে। তাই আমাদের ও সেই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি অবশ্যই দিতে হবে। ইদানীংকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র জে.এস.এস নয় "পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ" 'নাগরিক কমিটি' ইত্যাদির ব্যানারে আজ তারা বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করছেন এবং অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের উৎসাহব্যঞ্জক দিক। এটাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা আমাদের সবাই'র পবিত্র কর্তব্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভূমির অধিকার তথা সাংবিধানিক নিশ্চয়তা লাভের জন্য এসব হবে আমাদের বিকাশের মাইল ফলক বিশেষ।

আজ জুম্ম জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে। তাদের ভয় করার আর কিছুই নেই। বরঞ্চ ভয়কে জয় করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিছু লাভের সম্ভাবনাটাই উজ্জ্বল। কালের গতিধারায় আমাদের আন্দোলনের গতিধারাও কখনো নিয়মতান্ত্রিক, কখনো অনিয়মতান্ত্রিক কায়দায় এগুচ্ছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাক ভারতে উপমহাদেশ তথা বিশ্বে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই পরিবর্তনের হাওয়া জোরে বইতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম বুদ্ধিজীবিদের যথাসময়ে ঐকবদ্ধ ও নেতৃত্ব দানে বিলম্বিত হওয়া। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তি কালে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজ গড়ে উঠতে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সংযোগ সাধন ঘটাতে পারলে ব্যথতার গ্লানির মুখোমুখী হতে হতো না। এটা দুঃখজনক হলেও অপ্রিয় সত্য। বিশেষ করে পাকিস্তান বিদায়লগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হয়েছেন সরকারী চাকুরীর মধ্যেই কেহ কেহ তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই বাংলাদেশ জন্ম লগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আশানুরূপ আরো অনেককিছু আমরা করতে পারিনি।

১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হবার পর এ আন্দোলনের ধারা নিয়মতান্ত্রিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এ পর্যায়েও আমরা কোন কাজ না করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করার কোন যুক্তি আমাদের থাকবেনা। কথায় বলে,

....."সময়ে এক ফোঁর অসময়ে দশ ফোঁর।" অর্থ্যাৎ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করেনা। ঠিক সময়ে কোন কাজ হাসিল না করতে পারলে অসময়ে করতে গেলে তার খেসারত দিতে হয় অনেক। তাই আজকে যদি পার্বত্য চক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন যথাযথভাবে সফল না হতে পারলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবেনা। ব্যাপক সুশীল সমাজ সামনে এগিয়ে আসলে জয় আমাদের নিশ্চিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সুশীল সমাজ তথা বুদ্ধিজীবিরা একই কাতারে দাড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অধিকতর সামিল হবেন সেটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

গেংকুল্যা হোটেল

প্রোঃ সাগর চাকমা

এখানে সব ধরনের রুচিশীল খাবার পরিবেশন করা হয়।

স্থান- দীঘিনালা বাস টার্মিনাল, দীঘিনালা।

শীঘ্রই শুভ মুক্তি

চাকমা পুর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি-

"ভাঙি ন-অ পারে বুবর স্বপন"

(অব্যক্ত বোবার স্বপ্ন)

সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

সজ্পদর, কলেজ গেইট, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।

প্রতিহিংসা, উগ্রতা, আত্মঘাতী-দেশ প্রেম শেখায় না প্রতিবন্ধী বটে!

----কমল বিকাশ চাকমা
গবেষক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক।

তুমি এত সুন্দর, কি অপরূপ তোমার দৃশ্য, তোমার সাথে কারোর তুলনা হয় না- ওগো আমার পার্বত্য চট্টগ্রাম। ৫০৯৩ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত বাংলাদেশে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল জেলা এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। দশ ভাষা ভাষী এগারটি জাতিসত্বা সমূহের আবাসভূমি। এসব জাতিসত্বা সমূহের পূর্বে অন্যকোনো জাতির পদচারনার আজ অবধি প্রমাণ মেলেনি। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম মানে দশভাষাভাষীর জীবন। এসব জাতিসত্বা সমূহ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঘ, ভাল্লুক ও হিংস্র প্রাণীদের সাথে যুদ্ধ করে অধিকও দেশী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যুদ্ধ করে এখনো বেঁচে আছে। শতবছর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীর রক্ষা কবচের জন্য ১৯০০ সালের আইন প্রণয়ন করে এবং অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার প্রহর পেরিয়ে শত বছর পরে ১৯৯৭ সাল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দলিল জাতিসত্বা সমূহের রক্ষা কবচ। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীগণ নিজেকে বাংলাদেশী বলতে যেমনি গর্ববোধ করে তেমনি লজ্জাবোধ করে যখন সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতায় নিপীড়ন, নির্যাতন গৃহহীন হয়ে নিজদেশে পরবাসী জীবন যাপন বাধ্য হয়। দেশ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সরকার সমূহ মৌলবাদের বহিঃ প্রকাশ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দমন পীড়ন কোনো সময় থেমে থাকেনি। সরকারের সুকৌশল প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিভাজন, দমন পীড়ন, গণহত্যা এখনো বিদ্যমান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশ স্বাধীনতা পরবর্তী আদিবাসী জাতিসত্বা সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আঞ্চলিক রাজনীতি উত্তরন ঘটে। প্রবাদ আছে, যে জাতি সুসংগঠিত, সহনশীল দূরদর্শী সম্পন্ন সেই জাতির মৃত্যু নেই, তেমনি নীতিহীন রাজনীতির অপমৃত্যু অবধারিত। পৃথিবীতে উচ্ছশৃংখল কর্মহীন, পরনির্ভরশীল, দুরদর্শিতাহীন অনেকত জাতিসত্বা বিলীন হয়েছে। তাইতো প্রশ্ন জাগে অদূর ভবিষ্যতে কি

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতি সত্বা সমূহের মৃত্যু অবধারিত? আমার বাস্তব জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ল। ঘটনাটি হয়েছিল ১৯৯২ সালের শেষ দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় কোন এক স্থানে আমরা চার বন্ধু মিলে অন্তরংগ মুহূর্তে বসেছিলাম। আমি একা ব্যতীত অন্যরা সবাই অন্য ধর্মাবলম্বী। এমন দুর্লভ মুহূর্তে এক ভদ্রলোক উপস্থিত। ভদ্রলোক এসেই বললেন স্যার, স্যার (ভদ্রলোকের নাম বিমল) বিমল গত বছর ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কিভাবে নতুন ধর্মের ধর্মীয় আচরণ না করে পূর্বেকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচরণ করছে। এর বিচার করতে হবে স্যার। তন্মধ্যে এক বন্ধু বলে উঠলো ঠিক আছে বিমল তুমি যাও আমি দেখছি। বিমল সুবোধ বালকের মতো চলে যায়। সে বলে যাবার পর অপর এক বন্ধু বললে দেখ বন্ধু জাতি কিভাবে বিলীন হয়? তোমরা তো অনেক ছোট ছোট জাতিসত্বা রয়েছ। একটু মনযোগ দিলে নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারবে। হয়তো তোমার কাজে আসবে। আলাপচ্ছলে বলতে লাগল আমরা তো এখানে অতিথি মাত্র। তাদের সাথে হাজার বছর ধরে কোনো রক্তের কিংবা দেশ জাতির সম্পর্ক নেই। তারা আজ আমাদের আপন ভাবছে। অথচ যাদের সাথে হাজার বছর ধরে ওরা প্রতিবেশী, রক্তের সম্পর্ক তারা আজ আপন হয়েও পর। মনে হয় তাদের একে অপরের দূরত্ব কোটি মাইল ব্যবধান। অন্য বন্ধু বললো বন্ধু দেখ আমাদের কাছে বিমল কিংবা বিনয় এত গুরুত্বপূর্ণ নহে এখন দ্বিধামন নিয়ে চলবে। না পারবে নতুন ধর্মের লোক হতে, না পারবে পূর্বের ধর্মের লোক হতে। তাই সে উভয় ধর্মের আচরণ করবে। সুতরাং আমাদের দরকার তার ছেলেকে এবং তার অধিক দরকার তার নাতিকে। তার নাতি নাতনি হবে আমাদের প্রকৃত সাথী, তার অন্তরে দ্বিধা দ্বন্ধ থাকবে না। পাঠক বন্ধগণ দেখুন তোমার জাতিসত্বা বিলীন হওয়ার কৌশল।

অবিশ্বাস, সন্দেহ, খুন প্রভৃতি কুকর্ম সমূহ প্রতিহিংসা বাড়ায়। প্রতিহিংসা পরায়ন হলে আত্মঘাতী শেখায়। দেশে উন্নতি হয় না, প্রজন্ম ঘাটতি ও বিকলাঙ্গ হয়। মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ও কর্ম বিমুখ হয়। নারীগণ নিজ জাতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে ও অন্য জাতি বিবাহে উৎসাহিত হয়। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্বা সমূহ কোন অন্ধ কূপে পা বাড়াচ্ছে? ঢাকা, চট্টগ্রামের ইপিজেড সমূহে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হাজার হাজার নর-নারী জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে ১৫/১৬ ঘন্টা কাজ করে

একশত টাকা পেতে কষ্ট হয়। এবং সেই টাকা ও নুন আনতে পান্থা পুরোয়। বছর শেষে খেয়ে দেয়ে দু'হাজার টাকা ঋণ করে। তবুও ওরা যেন বাধ্যতা মূলক জীবন বেছে নিচ্ছে। কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে ও সুশিক্ষিত যুবক যুবতীর সন্ধান মেলা ভার। তবুও সময় এবং সুযোগে ওরা মন্দিরে যায়। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রার্থনা করে নির্মল জীবনের প্রত্যাশায়। শ্রদ্ধেয় নন্দপাল মহাথেরো ধর্মীয় দেশনা দানকালে এক সময় বলেছিলেন অযোগ্য ভূমিতে ফলন হয় না। তাই যদি হয় আসুন উগ্র, একরোগা, আত্মঘাতী, প্রতিহিংসা মনোভাব পরিহার করে বুদ্ধের সকল প্রাণী সুখী হোক মৈত্রীময় বাণী অংশ গ্রহণ মূলক কর্মে একত্রীভূক্ত হয়ে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সর্বোপরি দেশ গড়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। দেশ স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরে ও কেন আজ আমরা প্রাক্তন জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উক্তি বলতে হয় পাহাড়ীরা অসহায় আমি নিরূপায়। অন্যথায় শহরাঞ্চলে যেভাবে মায়ের কোল ছেড়ে সৎমায়ের আশ্রয়ের জীবন কাটাতে হচ্ছে। বলা দরকার ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলায় রাখাইন ছিল ৭০ হাজার আর বর্তমানে ১০ হাজার। ১৯৪৭ সালে বরিশালে রাখাইন ছিল ৫০ হাজারের অধিক আর বর্তমানে মাত্র ৪ হাজার পাঁচশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের গন্তব্যে কি সেভাবে চলছে?

গত জানুয়ারী/০৬ইং মাসে আমি উত্তরাঞ্চলে এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। কর্মশালাটি ছিল অংশ গ্রহণ মূলক কর্মগবেষণা। আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে গবেষণার পেশা নিয়ে আমার সৌভাগ্য হয়। সেখানে গিয়ে সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করা ভদ্র মহিলা জিজ্ঞেস করলেন "ভাই" আপনাকে কি আমি একখানা প্রশ্ন করতে পারি? আমি সম্মতি জানালাম। তিনি বললেন আপনার বাড়ীতো পার্বত্য চট্টগ্রামে। আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন "আচ্ছা আপনারা সেখানে বাঙালীদের তাড়িয়ে দেন কেন, মারেন কেন? আমরা তো আপনাদের তাড়িয়ে দেই না, মারিনা। তিনি প্রশ্ন করার পর মনে হল সেখানে অংশ গ্রহণ কারীদের কৌতুহল এক ও অভিন্ন। আমার খুব ভাল লাগলো। মনে হল এ যেন আমার সত্যিকারের মায়ের মতন কথা বলছেন। এতদিন আমার যে রকম অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ হয়নি। তৎজন্য রিইব এর শ্রদ্ধেয় ডঃ শামসুল বারী, ডঃ কোরবান আলী, ডঃ মেঘনা গুহ, সুরাইয়া আপা সহ অন্যান্যদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জানাচ্ছি। আমি ভাবলাম সত্য কথাটি যদি আজ মুখ খুলে বলতে পারি নিজেকে ঋণ মুক্ত মনে হবে। আমি বললাম ১৯৬০ ইং সনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ

প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁদ দেয়। উক্ত বাঁধের ফলে উদ্ভাস্তু হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন চাষযোগ্য জমি ছিল না বিধায় তাদের পূর্ণবাসন করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি। ফলে উদ্ভাস্তু পরিবার সমূহে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতও বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দেশ স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি হয়নি। অথচ ১৯৭৭-৭৯ ইং সনে চার লক্ষাধিক বাঙালীকে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। যাদের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীগণ সেটেলার কিংবা অনুপ্রবেশকারী বাঙালী বলা হয়ে থাকে। এবার বলুন তো সে সব সেটেলারদের কোথায় পূর্ণবাসন করা হয়েছে? উত্তর অতি সহজ। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মাথার উপরই তাদের বসানো হয়েছে। তাদের বাড়ী-ঘরে অগ্নিসংযোগ, খুন, ডাকাতি, অপহরণ, নিপীড়ন, নির্যাতন শিশু-নারী হত্যা ধর্ষণ সহ এ যাবৎ ১৩বার গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং বর্তমান অবধি সেখানে বেদখল চলছে। আমি আরো বললাম সেটেলার বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুপ্রবেশের আগেও বাঙালী ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, চাকুরীজীবি ছিল তাদের সাথে সম্পর্ক শতবছর ধরে। এক কথায় বলা যায় আদিবাসীদের তাড়িয়ে সেখানে অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের পূর্ণবাসন করা হয়েছে। ঘটনা শুনে ওরা হতবাক হলেন ও দুঃখ পেলেন। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন আপনি ইউ.পি.ডি.এফ করেন নাকি জে.এস.এস করেন? প্রতি উত্তরে বললাম আমি কোনোটাই করি না। সেদিন আমি ভদ্রলোককে উত্তর দিতে পারিনি। কেননা ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সেটেলার বাঙালী কর্তৃক অত্যাচারিত হয়েছি এখনো প্রায় ত্রিশ একরের অধিক মেরুং, রেংকার্য্যা ও এরেংছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক বেদখল হয়ে রয়েছে । আমি বুঝলাম, প্রতিহিংসায় বসবর্তী হয়ে খুন করা যায়, কিন্তু খুনীকে ও পরিনাম ভোগ করতে হয়, একজনকে খুন করলে ১০জন বিদ্রোহী হয়। আজ আমার মনে দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, প্রতি হিংসা নেই, আছে শুধু দেশ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা সর্ম্মান ও ভালোবাসা। তবুও নব প্রজন্মের প্রতি প্রশ্ন থাকলো মাছের পচন ধরে কান দিয়ে, আর জাতির পচন ধরে নেতা দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোথায় পচন ধরেছে। ..... আমি নির্বাক।

দীঘিনালার দীঘিফুল

বিশ্ব কল্যাণ চাক্‌মা

দীঘিনালার দীঘিফুল
নয় ফুল তুলতুল
তবে যেন সকলের
আদরের বুলবুল
দীঘিনালার দীঘিফুল।

দীঘিনালার দীঘিফুল
দীঘিরানীর কানের দুল,
তার শিক্ষা, সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের
প্রতীকি সমতুল
দীঘিনালার দীঘিফুল।

দীঘিনালার দীঘিফুল
কোন দীঘির নয় ফুল
ঐ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর
লেখনীর ফোটাফুল
দীঘিফুল দীঘিফুল।

দীঘিনালার দীঘিফুল
দীঘিবাসীর স্বপ্নমূল
পাড়ি দিতে চায় সে
সীমাহীন সাগরকূল
দীঘিফুল দীঘিফুল।

দীঘিনালার দীঘিফুল
শোভিছে মাইনীকূল
গর্ভমোদের তারে নিয়ে
স্বার্থক জনম নির্ভুল
দীঘিফুল দীঘিফুল।

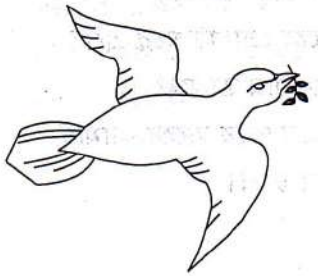
সুপ্ত প্রেম

প্রিয়দর্শীকা চাকমা
প্রথম বর্ষ (মানবিক)

স্বপ্নের মাঝে কতবার তোমার হাত ধরেছি
পাশাপাশি হেঁটেছি কিন্তু বাস্তবে?
পাশাপাশি হাঁটা, হাতে হাত রাখা!
কিছুতেই হয় না ভিড়ের মধ্যে
তোমাকে খুঁজে পেতেই সময় চলে যায়।
তাই বেঁচে থাক স্বপ্ন এবং স্বপ্নের মাঝে
পাশাপাশি হাঁটা তোমার হাত ধরে।
কারণ আমি জানি- সুপ্ত প্রেম
এ কখনো সুখের দাবি করে না।
এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়
এর পিছনে ক্লান্তি আসেনা, ম্লানতা আসেনা।

পদ্য লেখা

এ.কে.এম আনিসুজ্জামান
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)



হঠাৎ দেখি পড়ে গেছে
কলেজে পদ্য লেখার ধুম
লিখব কি ভাবছি বসে
নাইকো চোখে ঘুম।
সন্ধ্যা হলে পড়তে হবে
কলেজের পড়া
কখন লেখি কি যে লিখি
ভেবে যে হই সারা।
ভাবতে গিয়ে দু 'চোখ জুড়ে
নেমে আসে ঘুম
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি
পদ্য লেখার ধুম,
সকাল বেলা ওঠে দেখি
সময় যে আর নাই
কলেজে পদ্য লেখা
হলনা আর ছাই।

বিদায় ঘন্টা

কামরুন নাহার
ব্যবসা শাখা

বিদায় ঘন্টা বাজলেই চলে যাবো
দূর থেকে বহু দূরে।
খানিকটা আছি তোমার কাছে
ভালবাসার ছায়া দিয়ে।
ফুলের শুভেচ্ছা নিয়ে
এসেছি তোমার কাছে।
যেখান থেকে এসেছি
সেখানে যেতে হবে ফিরে।
অনেক দূরের যাত্রী আমি
বিপুল অবমাননায়।
বিদায়ের ঘন্টা বাজলেও
বাকী দিনটা তোমার কাছে।
শেষ ক্ষনে থেকো তুমি
হাস্যময়।
ওদিকে সব রেখে এসেছি
খেয়া ঘাটে।
বিদায় ঘন্টা বাজলেই
যেতে হবে অনেক দূরে,
আলোহীন শূন্য হাটে।

তোমার প্রতি

মোঃ নাজমুল হক (নাঈম)
বি.কম. ২য় সেমিষ্টার

লজ্জায় সংকোচে ছুয়ে যায় মন
নীরব থেকো তবে,
দোজনার চোখে চোখে তখন শুধু
সকল কথা হবে।
পরশ ফুলে তোমার মুদির মধু
মোরে দিও শুধু,
ভুলব নাকো আমি সারা জীবন
তোমায় মনে রবে।
আমার কবিতার বিনিময়ে আর
ছাইব না কিছু,
একটু যদি কাছে থাকো তুমি
মনে শিহরন জাগে।
মনে করো তোমায় স্বপ্নে এসে
আমি গেলাম ভালবেসে,
নয়ন মেলে পাবে নাকো আমায়
দূরে যাব চলে।

কেন তুমি এলে?

ডায়না এইচ.এস.সি.
বিজ্ঞান–১ম বর্ষ

আমি তো ছিলাম বেশ
নিজেকে নিয়ে,
আপন মনের ভাবনায়
আর হাসি–খুশি জীবনের ছন্দে;
কেন তুমি এলে ?
আমি তো ছিলাম বেশ একাকী
আবেশে,
ফাগুনের স্নিগ্ধ হাওয়ায়
আর চৈত্রের সোনা ঝরা রোদের;
কেন তুমি এলে ?
আমি তো ছিলাম বেশ
আপন ভুবনে,
কল্পনার রঙ্গের জীবনে
হাজার স্বপ্ন গুলো ঘিরে;
কেন তুমি এলে।

স্বপ্নে তুমি

জাহিদা আক্তার
একাদশ শ্রেনী

তুমি আমার ভালবাসা
তুমি আমার সব
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন আমার
তোমায় নিয়ে ঘর ॥
তোমায় ভালবেসে আমি
সুখী হতে চাই,
মরনের পরেও যেন
তোমায় আমি পাই ॥
এ জীবনে হৃদয় জুড়ে
আছ শুধু তুমি;
তুমি ছাড়া এ জীবন
শুধু মরুভূমি ॥
তুমি আমার দিনের আলো
তুমি আধাঁর রাত্রি ;
তুমি আমার প্রেমের আলো
জীবন চলার যাত্রী ॥
বুকের মাঝে রক্ত দিয়ে
লিখা তোমার নাম ;
তুমি ছাড়া বেঁচে থাকার
নেই তো কোন দাম ॥

অবুঝ মন

অনন্ত চাকমা
১ম বর্ষ(মানবিক)

মন তুমি কেমন?
তুমি যেন বিশাল এক ঢেউ
হঠাৎ সবকিছু পাল্টে দাও
জানে না কেউ।
মন তুমি কেমন?
থাকো লুকিয়ে
নীরবে বুকের মাঝে,
সুযোগ বুঝে তুমি
যাও দোলা দিয়ে।
মন তুমি কেমন?
দোলা দেবার সময়, হয়নি তোমার
ধৈয্য ধরো একটু,
আসবে সময় ভালোবাসার ।
মন তুমি কেমন?
চুপচাপ থাক শান্ত করে
এখনো আছে সময়,
দোলা দেবার
নইলে যাবে মরে।
মন তুমি কেমন?
তোমাকে যায় না দেখা
সাবধান অবুজ মন
তোমাকে নিয়ে আমার
এই কবিতা লেখা।

জাগো হে তরুণ

জেসমিন ত্রিপুরা (কার্ত্তিক)

এসো হে তরুণ
জুম্ম জাতির মুক্তির আন্দোলনে
জাতির জন্য এই মহৎ কাজে
ভয় করো না মরণে।

শত শত যুবক দিয়েছে রক্ত
লাখো লাখো জনতা দিয়েছে প্রাণ
তাদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ
জেগে ওঠ হে লাখো জোয়ান।

হে তরুণ, জাতির এই দুঃসময়ে
বসে থেকোনা আর বাড়ির কোণে
লড়াই করে বাঁচতে হবে
এই পার্বত্য চট্টগ্রামে।
জেগে ওঠো হে তরুণ
থেকো না আর ঘুমিয়ে
রক্তের বন্যা যারা ভাসিয়েছে
দিতে হবে তাদের তাড়িয়ে,
হে তরুণ, এসো জুম্ম জাতিকে বাচাই
শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে একত্রে করি লড়াই
তোমরাই পারবে অধিকার ছিনিয়ে আনতে
জাগিয়ে তুলতে পার সকল ছাত্র
সমাজকে।

সঙ্গিনী

প্রজ্ঞাকীর্তি চাকমা
১ম বর্ষ (মানবিক)

চপলা, চঞ্চলা, উচ্ছল, উর্বশী
মুখখানী গোলগাল যেন পূর্ণিমার শশী।
মাথা ভরা কালো কেশ কুটিতে ঝুলন্ত,
বাতাসের সাথে খুঁজিয়া হয়েছে ক্লান্ত।
কপালের কালো তিল, আধাঁরের লিপ্ত,
কাজল মাখা কালো চোখ দুটি অনুরাগে সিক্ত।
লাউয়ের ডগার মত নিরাবরণ বাহু দুখান,
পরশ আবেশে জুড়াতে পারে আমার মন প্রাণ।
নিটল,মসৃন তুল তুলে দুটি গালে,
সূর্যের সোনালী আলো প্রতিদিন যায় খেলে।
লজ্জা শীলা নম্র স্বল্প ভাষিনী,
কোকিল কণ্ঠি সুভাষিনী সুহাসিনী রমনী।
ধর্ম, কর্ম ও পোষাকে এক পাহাড়ী লালনা,
চলনে, বলনে কোথাও নেই কোন ছলনা।
দেহের চেয়ে সুন্দর তার মন,
তার চেয়ে সুন্দর তার আচরণ।
মাটির মলিন ধারায় যেন স্বর্গীয় জ্যোতি,
আমার দেহ-মনে ছড়িয়েছে দ্যুতি।
মুখটি তার চির চেনা মনে হয়,
মেয়েটি কেবল আমার অচেনা রয়।
কোথায় হতে এলে সেকি পরিচয় তোমার,
আধো ঘুমে আধো জাগরণে কেন এত অভিসার।
তোমায় নিয়ে ভাবনা কেন, কি আমার চাওয়া ?
হয়ত আমার প্রেমিকা কিংবা সহ- ধর্মীনি,
সে কবে থেকেই, তুমি আমার কাব্য লোকের সঙ্গীনি।

নেতা

দয়াল চাকমা
দশম শ্রেণী,
দীঘিনালা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে তোমার স্মৃতি; মানুষের মনে জমা
জয় করেছ বিশ্বতাকে, করেছ মানুষের মন,
বিশ্ব কাঁদে তোমার জন্য; কেন এভাবে চলে যাবে
সারা বিশ্বে তুমি দুঃখী মানুষের; আলোক বর্তিকা আর চন্দ্র,
তোমার আন্দোলন নীতি আদর্শ মোরা ভুলবনা,
মোরা তরুনেরা আন্দোলনে আছি, রবো সারা।
একদিন মোরা আসি তোমার নীতিতে; ছিনিয়ে আনবো জয়,
ভয় করিনা গুলি, মর্টার, গ্রেনেড হোক তা
জেগে দেবো শোষকের গজে ওঠা ডানপানা
মোরা এখন বিপ্লবে নীতিতে তোমার যুদ্ধে যাবো শৃঙ্খল ভাঙবো,
বাধা দিও না মা।

দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে **'দীঘিফুল'** নামক সাময়িকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানাই।

দেবমিত্র ভিক্ষু
অধ্যক্ষ
স্মৃতি ভাবনা বৌদ্ধ বিহার

বিচ্ছিন্ন চরের মানুষ আমরা

----------*রাখী চাকমা*
১ম বর্ষ (মানবিক)

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিটি সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন মাস, বছর ও শতাব্দী চলছে আপন গতিতে। এ চলার আদি ও অন্ত নেই। কবে থেকে শুরু হয়েছিলো কেউ বলতে পারে না। কবে শেষ হবে তাও কেউ বলতে পারে না। চলমান পৃথিবী এগিয়ে এসে আজ ২০০৬ সাল। আমি একটি প্রবন্ধ লিখতে প্রয়াসী হলাম। জানি না এই প্রবন্ধটি পাঠকের কতখানি মন জয় করতে পারবে!

শস্য শ্যামল এই পৃথিবী যেন স্বপ্নপুরী। তার গড়া এক সোনার দেশ। এই সুন্দর পৃথিবীতেই কেবা চায় মরতে। চারি দিকে নদী নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-বনাণীর ঘেরা যেন এক সাজানো বাগান। এই বাগানে জন্ম আমার, স্বপ্ন আমার বিশাল। প্রতিটি বিন্দু কোণার মত স্বপ্ন দেখি আমি প্রতিদিন। কিন্তু মানব জীবন বড়ই বিচিত্রময়। এই বিচিত্রময় পরিবেশে বেঁচে থাকা যত কঠিন, তার চেয়ে বেশী কঠিন বাস্ত্মবতা। এই বাস্তবতা নির্মম পরিহাসে জর্জরিত মানুষ গুলো যেন উদ্ভাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। সত্যিই এই জর্জরিত পরিবেশে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টে। যেখানে বেঁচে থাকা কঠিন, সেখানে স্বপ্ন দেখার অপেক্ষা রাখেনা। এই কঠিন বাস্ত্মবতার মাঝে স্বপ্ন গুলো যেন উড়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী যাচ্ছে সুন্দর সমাজ আজকের এই পৃথিবীর মাঝে। সুন্দর এই পৃথিবী এমনতো হওয়ার কথা ছিলনা। এখন আমার কি মনে হয় জানেন - আমরা এমন মাতৃভূমি বাংলাদেশের মধ্যে বসবাস করছি যেন কোন এক অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন চরের মানুষ। বা! কি দারুন দৃশ্য! পৃথিবী এত সহজেই বদলাতে পারে। আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একটি জাতি কত দ্রুত বদলাতে পারে। কি চমৎকার লিলাভূমি দৃশ্য খেলা। আমরা কি কখনো ভেবেছি লাখো শহীদের অর্জিত স্বাধীন এই বাংলা দেশ এমন একটি পর্যায়ে পরিণত হবে। কিন্তু হায়! সেই সুভাগ্যজনক অবস্থানের বিপরীতেই আমাদের প্রিয় দূর্ভাগা মাতৃভূমিকে আমি কিছুতেই মিলাতে পারছি না। কারণ পৃথিবীর বহিঃপ্রান্তে তাকালে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি অজানার পথে। জানি না সেই পথে কি আছে। মানুষের জীবন যেমন শেষ নেই, তেমনি আকাশের সীমাও শেষ নেই। পৃথিবী এমন একটায় সেখানে কাঁটাঝরার সাথে দু'চোখের অশ্রু কানায়- কানায় ভরা থাকে। "পদ্মা নদীর মতো"। যেখানে আমি এখনো অন্ধকার পথে হাতুড়ে বেড়াচ্ছি। এখনো আমি আমার পথের ঠিকানা পাইনি। সত্যি, কবে আমি বলতে পারবো সঠিক পথের ঠিকানা। #

রাঙাবি

যোগ সাধন চাক্‌মা
সহকারী অধ্যাপক (সমাজ বিজ্ঞান)
দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজ।

এদক দিনর হোচপানা থিলি
গেলেগোয় তুই খিললিখ আজি তুলি
এক্কানাও নচেলে ভাবি
বাজিম মুই হারে ভর গরি ॥
জীবনর চাওয়া পাওয়া
সেনত্যেই মুই নদিলং বাঁধা
হে অ পেবাগ, হে অ আরেবাগ
এইতো বিধির হেলা ॥
পেবেগোয় তুই যেদিন
মরও এব সেই দিন
সুগত্ নঅলেও দুগত্
পিচ্ছ্যে হদা তুলিশ একদিন ॥
জিয়োগোই দশহাল আগে একহাল
তুলনা নগরিচ এহাল এবং সেহাল
জিয়ান পেবে সিয়ানই সুখহাল
যা রাঙাবি যা.....
সুগে তেইচ তুই চিরহাল ॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'০৬ উপলক্ষে
দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের 'দীঘিফুল' প্রকাশনাকে
স্বাগত জানাই।

প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু
অধ্যক্ষ
বোয়ালখালী রাজ বৌদ্ধ বিহার